

الاشياء

২২২

اقتراب للناس

سُورَةُ الْاَشْيَاءِ وَهُوَ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكَ مُخَدِّثًا اَلَا لِيَسْمَعُوْهُ
وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ لَاهِيَةً فُلُوْهُمُ وَاَسْرُوْا لِنَجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
هٰذَا اَلَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝
فَلْيَرْيَ يَعْزَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَاَلْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝
بَلْ قَالُوْا اَضْعَافُ اَحْلَامٍ بَلْ اَفْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ قَلِيْلًا یَّتَّبِعُ
بَآیَاتِ كَمَا رَسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ مَا اَمَدَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ اَهْلَكْنٰهَا
اَفْهُمْ یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحٰی اِلَيْهِمْ
فَسَلُوْا اَهْلَ الَّذِیْنَ اَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ
جَسَدًا اِلَّا یَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِیْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمْ
الْوَعْدَ فَاَنْجَبْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءْ وَاَهْلَكْنٰ الْمُسْرِفِیْنَ ۝ لَقَدْ
اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِیْهِ ذِكْرُكُمْ اَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَكَمْ وَصَدْنٰ
مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظٰلِمَةً وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا خٰوِفِیْنَ ۝

## সূরা আশ্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়? (৪) পয়গম্বর বললেন : নজামগুল ও ভূমণ্ডলের কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে : অলীক স্বপ্ন; না-সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (১১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।

## আনুসঙ্গিক স্মৃত্যব্য বিষয়

সূরা আশ্বিয়ার ফযীলত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : সূরা কাহফ, মাইয়াম, তোয়া-হা ও আশ্বিয়া—এই চারটি সূরা প্রথমভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হেফাযত করি।—(কুরতুবী)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থাৎ, মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উস্মতই হচ্ছে সর্বসেষ উস্মত; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসেবও এতে शामिल রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যেই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কেয়ামত বলা হয়েছে।

من مات فقد قامت قيامته—যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কেয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পালে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গানাহের ভিত্তি।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكَ مُخَدِّثًا اَلَا لِيَسْمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ

لاهيَةً فُلُوهُمُ যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং

তজ্ঞন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয়া না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে।

اَفَتَأْتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে

কানাকানি করে বলে : এই লোকটি যে নিজেই নবী ও রসূল বলে দাবী করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ—ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা যেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহর যে কালাম পাঠ করা হত, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফেরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে যাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা যাদু এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নিবুদ্ধিতপ্রসূত ধোকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوْا اَضْعَافُ اَحْلَامٍ যেসব স্বপ্নের মানসিক অথবা শয়তানী

কল্পনা शामिल থাকে, সেগুলোকে অহলাম বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ "অলিক কল্পনা" করা হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে যাদু বলেছে : এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু



রেওয়াকে অনুযায়ী মুসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়াকে অনুযায়ী শোআয়ব বলা হয়েছে। শোআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শোআয়ব (আঃ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্ রসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী-ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও शामिल থাকবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا الْعِزِينَ

আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিতে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রেসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলের সৃষ্টি করেছি?

لَعِبٍ শব্দটি لعب ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোন লক্ষ্যহীন কাজকে لعب বলা হয়।— (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لعب বলা হয় ইসলামবিरोधीরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবী করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট কর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী।

لَوَارِدَاتٍ أَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَكْفُرُوا

অর্থাৎ, আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং একাজ আমাকে করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় لو শব্দটি অবাস্তুর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لو শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্যে এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়— আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে।

له শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই

উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : له শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওয়ায়র (আঃ)-কে আল্লাহ্ র পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। واللہ اعلم

قَذَفَ - بَلَّ نَقْنَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُّ مَعَهُ فَاذَاهُ وَرَأْفُ

শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يدمغ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زهق এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যার্চ্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عَدَاكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে, (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার এবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার এবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবতঃ অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী এবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। (এক) কারও এবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই এবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) এবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে এবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের এবাদতে এ দু'টি অন্তরায় নেই। তারা এবাদতে অহংকারও করে না যে, এবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং এবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করেন না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেন : আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম : তসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন : শ্রিয় ভাতুপুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন— আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।—(কুরতুবী, (বাহুরে মুহীত)

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذْنَا مِنَ الْأَرْضِ مَاءً فَنُفِثَهُ

এতে মুশরেকদের অবর্তীতনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা

তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিক্রীম থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হয়ে। (দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টিক্রীমের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যস্বাভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় খোদা পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী

হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী آيَاتُ مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يُسْتَأْذِنُونَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে খোদা হতে পারে না। খোদা তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই খোদা থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করারও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা খোদায়ী পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَىٰ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِهِ — এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَىٰ বলে কোরআন এবং ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِهِ বলে তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইঞ্জিলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভবে এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্যে তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্যে এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কেচ্ছাকাহিনী জীবিত আছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ  
لِلَّهِ إِلَّا أَنَا عَابِدُونَ ﴿۳۱﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا  
سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿۳۲﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ  
بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۴﴾  
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ  
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ أَوْ كَرِهَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۶﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ  
تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۷﴾  
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۸﴾  
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلْبُوتَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ  
أَقَلِّينَ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۴۰﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  
الْمَوْتِ وَنَبُؤُكُمْ بِالْأَشْرَارِ وَالْأَخْيَرِ فَنَدْنَاهُ أَلَيْسَ أَتْرَجَعُونَ ﴿۴۱﴾

(২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। (২৬) তারা বলল : দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্প্রদায় বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্প্রদায় ও পক্ষাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্রাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না। এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

أَوْ كَرِهَ الَّذِينَ كَفَرُوا (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

শব্দে রত্ন - অর্থ বন্ধ হওয়া এবং ফত্ন এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি রত্ন ও ফত্ন কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে “বন্ধ হওয়া” ও “খুলে দেয়ার” অর্থ কি এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায় কেরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণের যে উক্তি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জ্ঞানেক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন : এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتَقْنَا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হত না আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর এ তফসীর শুনে বললেন : এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিস্তান দান করেছেন। তিনি رَتْقًا ও فَتَقْنَا এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থ প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্ণে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও

জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহমদের সনদ দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর কাছে আরম্ভ করলাম; “ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন : “প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।”

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا تَأْوِيلُونَ আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীর কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুলকোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী খানভীও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

فلك বলি। প্রত্যেক বস্তুর বস্তুকে বলি। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে المغزل বলা হয়। (রুহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مِنْ قِبَلِكُمُ الْخَلْدَ প্রমাণ সহকারে কাকের ও মুশরেকদের বিভিন্ন দাবী ঋণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবীসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ওয়ায়র (আঃ)—কে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আঃ)—কে আল্লাহ্র সন্তান বলা। এই ঋণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মকার মুশরেকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত ; যেমন— কোন কোন আয়াতে আছে تَرْتَضُّ بِرَبِّهِ الْمُتُونِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই অনর্থক কামনার দৃষ্টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুওয়ত স্বীকার কর, তাঁর কি মৃত্যুবরণ করেননি?

তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুওয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারনা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে?

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُنْتُمْ دَارِمَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব-মাএই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি—না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : মানুষসহ মর্তের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন : ফেরেশতা এবং জান্নাতের হ্র ও গেলমান মৃত্যুর আওতাভিত্তিক।— (রুহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।— (রুহুল-মা'আনী)

دَارِمَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আশ্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান শ্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহুওয়াল্লা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্যে ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

وَتَبَوُّؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা : وَتَبَوُّؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। যেমন— অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবার করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। ব্যুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবার করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকে অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন :

بَلِينَا بِالضَّرِّ فَصَبْرُنَا وَبَلِينَا بِالسَّرِّ فَلَمْ نَصْبِرْ—অর্থাৎ, আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবার করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবার করতে পারলাম না। অর্থাৎ, এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।





(৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম।’

(৪৭) আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) আমি মুসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ-ভীরদের জন্যে — (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাখিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর? (৫১) আর, আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপুত্র দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সত্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন : ‘এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমার পূজারী হয়ে বসে আছ’? (৫৩) তারা বলল : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন : তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (৫৫) তারা বলল : তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন : না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন ; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা : وَنَضُمُ الْمَوَازِينَ ﴿٢١﴾  
 এর বহুবচন। অর্থ—

ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্যে অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উস্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটাই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ, এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে – সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।— (মায়হারী)

অর্থাৎ হিসাবের দিন — وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিথী হযরত আয়েশার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সামনে বসে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার দু’টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদুয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضُمُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ — লোকটি আরম্ভ করল : এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।— (কুরতুবী)

এই তিনটি গুণই তওরাতের। — الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ  
 অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, অর্থাৎ, মানবাত্মার জন্যে আলো এবং ذِكْر অর্থাৎ মানুষের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন : ফُرْقَانَ বলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মুসা (আঃ)—এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফেরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার সময় আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে লালিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী

الانبياء

২২৪

اقتراب للناس

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَيْدَ الْهَيْمَانِ لَعْنَهُمْ لَعْنَهُمْ لِيَوْمِ يُرْجَعُونَ ﴿٥٤﴾  
 قَالُوا مَنْ قَلْبِنَا هَذَا يَا هَيْمَانُ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا  
 سَمِعْنَا قَتْلَى يَدُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٥٦﴾ قَالُوا  
 قَاتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعْنَهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا  
 أَأَنْتَ قَلْبِنَا هَذَا يَا هَيْمَانُ يَا بَرِّهَيْمُ ﴿٥٨﴾ قَالَ بَلْ قَلْبِنَا هَذَا  
 كَيْدُهُمْ هَذَا فَسَوُّهُمْ إِنَّ كَانُوا يَطْفُونُ ﴿٥٩﴾ قَرَجَعُوا إِلَى  
 أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى  
 رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَمِلْتُمْ مَآلُؤًا لِرِجْزٍ قَدِيمٍ ﴿٦١﴾ قَالِ اقْبَلُونِ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٢﴾ أَوْفِ  
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾  
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٤﴾  
 فَلَمَّا نَبَا رُؤُوسِهِمْ أَنِ ارْتَدَوْا عَلَىٰ رُبِّهِمْ ﴿٦٥﴾ وَارْتَدَوْا  
 بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَسِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٦٨﴾

(৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তারা বলল : আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জান্নাম। (৬০) কতক লোক বলল : আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল : তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বলল : হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করছে? (৬৩) তিনি বললেন : না, এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এক বলল : লোকসকল; তোমরাই যে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে পেল মস্তক নত করে : 'তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না'। (৬৬) তিনি বললেন : তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এক ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) মিক তোমাদের জন্যে এক তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৮) তারা বলল : একে গুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম : 'হে অম্মি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক কতিবস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাঁকে ও লুতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরুষস্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এক প্রত্যেককেই সৎকর্মস্বরূপ করলাম।

সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, اللہ تبارک و تعالیٰ এর পরে او দ্বারা পৃথক করা থেকে ইস্তিত বোঝা যায় যে فرقان তওরাত নয়—অন্য কোন বিষয়।

وَتَاللَّهِ لَآ كَيْدَ لَكُمْ أَصْحَابُكُمْ

যে, একথাটি ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাদের কাছে اِنِّي سَعَيْتُمْ (আমি অসুস্থ)—এর ওপর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানের রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইব্রাহীম (আঃ)—এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বোঝে নিত যে, ইব্রাহীমই একাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরে সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবতঃ তাঁর কথার দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি এবং ভুলেও যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইব্রাহীম (আঃ)—এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন : ইব্রাহীম (আঃ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে।—(কুরতুবী)

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَجَعَلَهُمْ جُودًا — جذ شব্দটি جُودًا — এর বহুবচন। এর অর্থ খন্দ।

অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খন্দবিখন্দ করে দিলেন।

الْأَكْبَرُ لَهُمْ — অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই

দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعْنَهُمْ لَعْنَهُمْ لِيَوْمِ يُرْجَعُونَ — লَعْنَهُمْ লَعْنَهُمْ লِيَوْمِ يُرْجَعُونَ —

কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইব্রাহীম (আঃ)—এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খন্দ-বিখন্দ দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইব্রাহীম (আঃ)—এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (দুই) কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كبير (প্রধান মূর্তি)—কে

বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খন্ড-বিখন্ড এবং বড় মূর্তিকে আশু অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিঞ্জেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-- রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা :

قَالَ بَلْ فَعَلَّكَ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ لِيُؤْثِرُوا عَلَىٰكَ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে প্রশ্ন করল : তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দিলেন : না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিঞ্জেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যতঃ বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্ব। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল-কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ, তোমারা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন— কোরআনে আছে

إِنَّ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَرِثَةٌ ۖ إِنَّهَا غِنًى ۖ وَرِثَةُ الْيَتٰمٰى  
অর্থাৎ, রহমান 'আল্লাহ' এর কোন সম্ভান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর এবাদতকারীদের তালিকাতুচ্চ হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন জওয়াব বাহরে-মুহীত, কুরতুবী, রুহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازى তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আঃ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্পন্ন করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আঃ)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কার্যতঃ মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্পন্ন করেছিলেন। রেওয়াজেতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্পন্ন করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি اثبت الربيع البقلة (অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা। কিন্তু এ উক্তিভেদে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্পন্ন স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যতঃ ও উক্তিগতভাবে সম্পন্ন করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী

উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবতঃ পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হত, তবে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্পন্ন করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাবুশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে :

قَالَ بَلْ فَعَلَّكَ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ لِيُؤْثِرُوا عَلَىٰكَ  
মোটকথা, কোন দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্পন্ন নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্পন্ন করার স্বরূপ : এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث :— অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি।—(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্যে বলা হয়েছে। একটি

بَلْ فَعَلَّكَ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ —আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওয়র গেশ করে اِنِّي سَيِّئٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি শতীর হেফাজতের জন্যে বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) শতী হযরত সারাহসহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যতিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার শতীকে দেখলে সে শতীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যতিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আঃ)-এর শতীসহ এই জনপদে পৌছার খবর কেউ এই যালেম ব্যতিচারীর কাছে পৌছে দিলে সে হযরত সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আঃ)-কে জিঞ্জেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আঃ) যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বলে দিলেন : সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসঙ্গেও সারাহকে গ্রেফতার করা হল। ইবরাহীম (আঃ) সারাহকে বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিরপীত বলা না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী বাতৃয়ে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আঃ) যালেমের যোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সর্বিনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ যালেমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখন সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হস্বে গেল। তখন সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ

সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ।) এই হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)—এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্পর্ক করা হয়েছে, যা নবুওয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় “তওরিয়া”। এর অর্থ দুর্থাবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলে। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটা “তওরিয়া”। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের “তাকায়্যুহ” থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন—ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লেখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। **بَلْ فَعَلَهُ كِبْرَهُمْ**—এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে। **أَنْ سَقِيمٌ** বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, **سَقِيمٌ** (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই “আমি অসুস্থ” বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতার একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিল। এই হাদীসেই “তিনটির মধ্যে দু’টি মিথ্যা আল্লাহর জন্যে ছিল” এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহর জন্যে করার কোন অর্থই হতে পারে না; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে—একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

**ইবরাহীম (আঃ)**—এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া মুর্খতা; মিথ্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)—কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবেন, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই

নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধসনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং সম্পূর্ণবুদ্ধিতা ও বক্তবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে একথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, “তিনটি মিথ্যা” বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে **كذِبَات** (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মুসা (আঃ)—এর কাহিনীতে হযরত আদম (আঃ)—এর ভুলকে **عصى و غوى** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাক এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্যে পয়গম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)—এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্যে দন্দায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ হাদীসে বর্ণিত তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্যে হাদীসে এগুলোকে **كذِبَات** তথা, “মিথ্যা” শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ) মিথ্যা বলেছে বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মুসা (আঃ)—এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়াজের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

**উল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা**; হাদীসে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু’টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্যে ছিল, কিন্তু হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাত দ্বীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন: তৃতীয়-মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সংকম্পরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। যদিও এটা দ্বীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হোফায়ত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে **فِي اللَّهِ** (আল্লাহর মধ্যে) এবং **لِللَّهِ** (আল্লাহর জন্যে) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন: **أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ**—(খাঁটি এবাদত আল্লাহর

জন্যেই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্যে এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুন্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ : যারা মু'জেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্যে অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না— দর্শনশাস্ত্রের এইনীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্যে কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্যে ঠান্ডা করা ও নির্বাণ করা জরুরী, কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ— যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ তাআলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাণ ও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করে; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে তা আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা নমরূদের অগ্নিকুন্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন : তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের আগে وَسَلْمًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আঃ)-এর সলিল সমাধিপ্ৰাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে : اَعْرَضْنَا عَنْهُمْ آيَاتِنَا — অর্থাৎ, তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرُوتًا — অর্থাৎ, সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাত দিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুন্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য

কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে 'মিন্জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আঃ) মিন্জানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দুলোক ও ভুলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল : ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন : আল্লাহ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল : প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।—(মাযহারী)

فَلَمَّا يَأْتِ كُتُبِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ — পূর্বে বর্ণিত

হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে সম্ভবতঃ অগ্নি অগ্নিই ছিল না; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। ইবরাহীম (আঃ)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আশুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর দেহ সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আঃ) এই অগ্নিকুন্ডে সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন : এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।—(মাযহারী)

وَنَزَّيْنَةُ وَ لَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ — অর্থাৎ,

ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ, ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً — অর্থাৎ, আমি তাঁকে (দোয়া ও

অনুরোধ আনুষাঙ্গী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَةٌ বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  
 الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا الْبَائِسِينَ  
 وَلَوْ طَافْتَ فِي نَجْمِهَا وَعِلْمِهَا وَنَجْمِهَا مِنَ الْقُرْيَةِ الَّتِي  
 كَانَتْ تَعْمَلُ الْحَبِيثَ إِيَّاهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَيُؤْتُونَ  
 وَأَدَّخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَنُوحًا  
 إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  
 الْعَظِيمِ ۝ وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَدَاوُدَ  
 وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الشَّرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمٌ  
 الْقَوْمِ وَكَانَ الْحُكْمُ لَهُمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ  
 وَكَلَّمَآ تَيْنَاهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ  
 يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ  
 لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 شَاكِرُونَ ۝ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝

(৭৩) আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সংকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার এবাদতে ব্যাপ্ত ছিল। (৭৪) এবং আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোহের কাছে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সংকর্মশীলদের একজন। (৭৬) এবং সুরণ করুন নূহকে; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম। (৭৮) এবং সুরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাতিকালে কিছু লোকের মেঘ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।

যে জনপদ থেকে লুত (আঃ)-কে উদ্ধার করার কথা আলাচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদূয়। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আঃ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লুত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল।—(কুরতুবী)

এর বহুবচন। অনেক নোহেরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে খিব্ঠ শব্দটি খিব্ঠ - এর বহুবচন। অনেক নোহেরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে খিব্ঠ বলা হয়। “নাওয়াতাত” ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোহেরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকে খিব্ঠ বলা হয়ে থাকলে তাও অবাস্তব নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ ছাড়া অন্যান্য নোহেরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়াজসমূহে উল্লেখিত আছে। রহুল মা’আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে খিব্ঠ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

এর অর্থ ইবরাহীম ও লুত (আঃ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আঃ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : رَبِّ لَكَ نَدْوَى عَلَى الْأَرْضِ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরাপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরয় করলেন, — اِنِّي مَخْلُوبٌ فَانصُرْ — অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

كرب عظيم - فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

(মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্ঘাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আঃ) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালাত।

অভিধানে نفس শব্দের অর্থ রাতিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنَاهَا - فَفَهَّمْنَاهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ মোকদ্দমা

ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয়পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : দুই লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও

অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আঃ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা, ফেকাহর পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কেয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি যোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিতে দেয়। হযরত সূলায়মান বললেন : আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্যে উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ বললেন : এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? সূলায়মান বললেন : আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত্রে ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগ পাল ছাগলের মালিককে প্রতাপর্ণ করুন। হযরত দাউদ (আঃ) এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায়দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন : এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আঃ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সূলায়মান (আঃ)—এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজ্তিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজ্তিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজ্তিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজ্তিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজ্তিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবু মুসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজ্তিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।— (কুরতুবী সংক্ষেপিত)

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ : وَسَخَّرْنَا مَدْرَدَ الْجِبَالِ سَيْجِنًا وَالطَّيْرَ كُلَّهَا فَعَلَيْنَ - হযরত দাউদ (আঃ)—কে আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহর আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জ্জেয। মু'জ্জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জ্জেয হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন : আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত দাউদ (আঃ)—এর সুমধুর কঠস্বরই দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেন : আপনি শুনছেন— একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম।— (ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া উচিত। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়ব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আঃ)—কে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দান করা হয়েছিল وَعَكْنَتْهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُورٍ - অস্প্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানে তাকেই لَبُؤْسٍ বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَالْحَرِيدِ - অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত। তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা-সরু করতে পারতেন। (দুই) আগুনে গালিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বুরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আঃ)—কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, لِيُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ - অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সূতীক্ষ্ম তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়দার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা

শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আঃ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (আঃ) বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা-জননী মত। তিনি নিজের সম্বন্ধেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরআউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্শ্ব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়াহায মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَسَخَّرْنَا مَعَ عَاصِفَةَ - এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন দাউদ (আঃ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রাধান্যযোগ্য যে, দাউদ (আঃ)-এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্যে) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সুস্বত্র ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আঃ) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তসবীহ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্যে অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি

যখন ইচ্ছা, যদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লক্ষ্যসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।—(রুহুল-মা'আনী, বায়যাতী)

তফসীর ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আঃ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দুরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দুরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌঁছে দিত। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আঃ) মাথা নত করে আল্লাহর যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।—(ইবনে কাসীর)

عَاصِفَةَ এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ عاصف বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যতঃ এই দু'টি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না।

الإشياء

৩৩.

اقتراب للناس

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا  
 دُونَ ذَلِكَ وَكَأَلْهُمْ حَفِظِينَ ۝ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ  
 رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝  
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ  
 مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ ۝  
 وَأَسْمَاعِيلَ إِذْ رَفَعْنَا وَذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝  
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَ  
 ذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا أَظَنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  
 فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ  
 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  
 مِنَ الْعَمْرِ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝  
 وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ  
 الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ الْيَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا  
 لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ  
 يَدْعُونَ تَارِعًا ۝ وَرَهَبًا ۝ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۝

(৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্যে দুর্বীর  
 কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে  
 নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (৮৩) এবং সূর্য করুন আইয়ুবের কথা, যখন  
 তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি দুঃখকষ্টে পতিত  
 হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর  
 আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং  
 তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ  
 আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ ; আর এটা এবাদতকারীদের  
 জন্যে উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা  
 সূর্য করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবারকারী। (৮৬) আমি তাঁদেরকে  
 আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সংকল্পপরায়ণ।  
 (৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা সূর্য করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন,  
 অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর  
 তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : তুমি বতীত কোন উপায় নেই ;  
 তুমি নির্দোষ আমি পোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া  
 দিলাম এবং তাঁকে দুঃখিতা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে  
 বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা সূর্য  
 করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল : হে আমার  
 পালনকর্তা, আমাকে একা রেখে না। তুমি তো উত্তম ওয়ালিস। (৯০)  
 অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম  
 ইয়াহুইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা  
 সংকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও জীতি সহকারে আমাকে ডাকত  
 এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ :

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكَأَلْهُمْ حَفِظِينَ - অর্থাৎ, আমি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত ; يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ - অর্থাৎ, তারা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে

বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়লা তৈরী করত। সুলায়মান তাদের অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيْطَانٍ - শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টি

দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্যে আসলে جن অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়— কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আঃ)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আঃ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيْطَانٍ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জ্বরদস্তি সুলায়মান (আঃ)-এর আঙ্গাধীন থাকত। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সৃষ্টি তত্ত্ব : দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে দেখাও যায় না এমন সৃষ্টি বস্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। —(তফসীর কবীর)

আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী : আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়াজেত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়াজেতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবার করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন :

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আঃ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত,

সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সম্ভান-সম্ভতি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুণ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ, আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আঃ)।— [ইবনে-কাসীর] সাহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবায়ত্ন করতেন। আইয়ুব (আঃ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসুল করীম (সাঃ) বলেন : **اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل** অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সংকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়াজেতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ এবং পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তব্য আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আঃ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ (আঃ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবার করার ক্ষেত্রে আইয়ুব (আঃ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন : আল্লাহ যখন আইয়ুব (আঃ)-কে অর্থকড়ি, সম্ভান-সম্ভতি ইত্যাদি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও এবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরও করেন : হে আমার পালনকর্তা ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সম্ভান-সম্ভতি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী ছিল না : হযরত আইয়ুব (আঃ) পার্শ্ব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হ-ছতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার-আরও করেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন : আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা

বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়।) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল— বেসবরী ছিল না। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন : **وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مَلِيًّا**—(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণে বর্ণনায় রেওয়াজেতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হল : পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব (আঃ) তদ্রূপই করলেন। ঝরণার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জঞ্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করতঃ আবর্জনার স্তপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট আইয়ুব (আঃ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইয়ুব (আঃ) বললেন : আমিই আইয়ুব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন : আপনি কি আমার সাথে পরিচয় করছেন? আইয়ুব (আঃ) আবার বললেন : লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়ুব। আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন : এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সম্ভান-সম্ভতিও। শুধু তাই নয়, সম্ভানদের সমসংখ্যক বাড়তি সম্ভানও দান করলেন।— (ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সম্ভানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সম্ভানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে **وَوَسَّوْهُمْ مَعَهُمْ** বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন : এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম।— (কুরতুবী)

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাইল ও ইদরীস যে নবী ও রসুল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাসীর বলেন : তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে शामिल করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন

না; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ষিক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই : সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করতঃ সে বলল : আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন : তুমি সদাসর্বদা রোযা রাখ, এবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোসসা কর না? লোকটি বলল : নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবতঃ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখেন, শয়তান তার সাস্ত্রপাঙ্গদেরকে বলল : যাও কোনরূপে এই ব্যক্তি দূরা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদরূন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাস্ত্রপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল : সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল : তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কে? উত্তর হল : আমি একজন বৃদ্ধ ময়লুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্যে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মোকদ্দমার ফয়সালা করার জন্যে আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্যে গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিঁটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হল : আমি একজন বৃদ্ধ ময়লুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন : আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল : হুযুর, আমার শক্রপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলাতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না

দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিবেশ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ভেতর ঢুকলে কি ভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন : তা হলে তুমি আল্লাহর দূশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল : আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জ্বালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ অস্বীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অস্বীকার পূর্ণ করেছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَدَا الْهُنُونَ — হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)—এর কাহিনী

কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আশ্বিয়া, সূরা ছাফফাত ও সূরা নূনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'য়ুনুন' এবং কোথাও 'ছাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও ছাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়াল। ইউনুস (আঃ)—কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নুনও বলা হয় এবং ছাহেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আঃ)—এর কাহিনী : তফসীর ইবনে-কাসীরে আছে, ইউনুস (আঃ)—কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সংকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন রেওয়াজে থেকে জান যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবালা-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঝাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।—(মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আঃ)—এর

প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পশ্চিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আঃ)—এর নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হল। এবারও ইউনুস (আঃ)—এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস (আঃ)—এরই বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে **فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ** অর্থাৎ, লটারীর ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আঃ)—এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যিক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তাআলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আঃ)—কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তাআলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আঃ)—এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় ; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে-কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যতঃ আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজ্জতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজ্জতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্ঞন্যে আল্লাহ তাআলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজ্জতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না, কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তব্য অনেক উর্ধ্ব। তাঁদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্ঞন্যে ধৃত করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আঃ) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যতঃ তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আঃ)—এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে

কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাবদানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়।—(কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আযাতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

**ذَهَبَ مُغَاظِبًا** — অর্থাৎ, ত্রুট হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা **رَبِّ** শব্দটিকে **مُغَاظِبًا** এর **مَفْعُول** বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে **مُغَاظِبَالِهِ** অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ত্রুট হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

**فَطَرْنَا أَنْ كُنْ تَقْرَىٰ عَلَيْهِ** — অভিধানের দিক দিয়ে **نَقَر** শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি **قَدَرْتُ** ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আযাতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দুরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আযাতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, এটা **قَدَر** ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ;

যেমন এক আযাতে রয়েছে **اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আযাতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, তফসীরের অর্থে এটা **قَدَر** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেয়া। আযাতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, এব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আঃ)—এর দোয়া প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে **مَكْبُول** : **وَكَذَلِكَ نُسَبِّحُ الْمُؤْمِنِينَ** — অর্থাৎ, আমি যেভাবে ইউনুস (আঃ)—কে দুশিষ্টা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

**لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** — মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ)—এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন।—(মাযহারী)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)—এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে **وَإِنَّكَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ** ও বলেছিলেন : অর্থাৎ, পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন

الانبیاء ২১

৩৩১

اقترب للناس ۱۴

وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَفَتَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَ  
 جَعَلْنَا وَأَبْنَاءَ آيَةَ لِلْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ  
 أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَنَقَطْنَا لَهُمْ  
 بَيْنَهُمْ مَثَلًا لِّلَّذِينَ جَحَدُوا ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ إِن لِّسَعْيِهِ وَأَنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝ وَ  
 حَرَّمْنَا عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا  
 فُتِحَتْ يَا حُجُورُ وَمَا جُوبِرُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝  
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا يَا وَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ  
 كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 حَصَبٌ جَعَلْتُمْ أَنتُمُوهَا وِرْدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ  
 إِلَهًا مَا وَّرَدُوا مَا وَّرَكُوا فِيهَا خَلِيدُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا  
 زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ  
 لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ  
 حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِيدُونَ ۝

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিস্বাসী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজ্জুজ ও মাজ্জুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উন্মুক্ত হয়ে যাবে; হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; বরং আমরা গানাহগারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোষের ইচ্ছা। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোষ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার স্নেহময় শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।

বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ তাআলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

وَيَذُوعُونَ رَجَبًا وَرَهْمًا — তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ, সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআলাকে ডাকে। এর একরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা এবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও সাথে এবং স্বীয় গোনাহ ও ত্রুটির জন্যে ভয়ও করে। — (কুরতুবী)

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَ حَرَّمْنَا عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ — এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا حُجُورُ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্যে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حَرَام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্যে দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী। — (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সংকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا حُجُورُ وَمَا جُوبِرُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজ্জুজ মাজ্জুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম : আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন : যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কয়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তাআলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম